বাতায়ন

শালগ্রাম উপাসনার ধারা

শ্রেয়সী মল্লিক
পি এইচ ডি গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

"আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন— মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না।"[১] উনিশ শতকে শহর কলকাতায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বয় ভাবনায় যে-শালগ্রামকে দেখেছিলেন তার জন্মরহস্য থেকে দেবত্বে উত্তরণ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগের বিষয়। দুহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এর উপাসনার ধারা চলে আসছে। নেপালের মুস্তাং উপত্যকায় বিশেষত কালীগণ্ডকী নদীগর্ভে এবং তিব্বত সীমান্তে দামোদর কুণ্ডে কালীগণ্ডকীর শাখানদীগুলিতে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। কালীগণ্ডকী নদীর উৎস নেপাল-তিব্বতের গণ্ডক পর্বত, যার পৌরাণিক নাম দ্বিকূট পর্বত, পরবর্তী কালে নাম শালগ্রাম পর্বত এবং বর্তমানে মুক্তিনাথ পর্বত। অভিধান বা শব্দকোষে 'শালগ্রাম' শব্দটির সংস্কৃত বা বাংলা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ নেই। সম্ভবত তিব্বতের স্থানীয় কোনও ভাষা থেকেই এর উৎপত্তি। তিব্বতের মুস্তাং আঠারো শতকের শেষে নেপালের অধীনে আসে। সেখানে আদিম অধিবাসীদের কিছু মাটির ঢিপিতে শালগ্রাম শিলা খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নবিজ্ঞানীরা। তাঁদের অনুমান তিব্বতের প্রাচীন বন ধর্ম এবং শামানিক ধর্মে উপাসনার প্রতীক ছিল শালগ্রাম। জার্মান ভারততত্ত্ববিদ Gustav Oppert-এর মতে আর্যপূর্ব আদিবাসী সংস্কৃতিতে এই শিলা স্ত্রীশক্তির প্রতীক কুণ্ডলিনী ভবানী বা মহাদেবী হিসেবে পূজিত হত। ১৯০৮ সালে ভূবিজ্ঞানী কাউপার রিও এবং টনি হেগেন প্রথম জানান, নেপালের মুক্তিনাথ অঞ্চলে কালীগণ্ডকীর বিভিন্ন উপনদীতে যে-শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় তাতে অ্যামোনাইট ধরনের জীবাশ্ম আছে। শিলার চক্রচিহ্নই জীবাশ্মের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

বৈষ্ণবমতে শালগ্রাম শিলা হল চক্রচিহ্নযুক্ত ভগবান বিষ্ণুর প্রতিভূ। শালগ্রাম এবং দ্বারকা—বিষ্ণুর দুটি শিলারূপই আসলে জীবাশ্ম বা ফসিল। মহাকাব্য, পৌরাণিক সাহিত্য এবং তন্ত্রে শালগ্রাম শিলার বহুল উল্লেখ রয়েছে। শব্দকল্পদ্রুমে পদ্মপুরাণের সূত্র নির্দেশ করে শালগ্রাম শিলার দুটি অর্থ বলা হয়েছে—'গণ্ডকীজাত বজ্রকীটকৃত শিলাময় বিষ্ণুমূর্তি-বিশেষ' এবং 'দ্বারকোদ্ভূত বজ্রকীটকৃত চক্রযুক্ত শিলা'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষের সঙ্গে বাচস্পত্য অভিধান উদ্ধার করে বলেছেন, 'শালগ্রাম পর্বতে বিষ্ণুমূর্তিভেদই হল শালগ্রাম।' এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে—বিশেষ ভৌগোলিক উৎস, উৎপাদক বিশেষ পৌরাণিক জীব এবং বিষ্ণুপ্রতীক। নগেন্দ্রনাথ বসুও বিশ্বকোষে ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্খায়ন ভাষ্য উদ্ধার করে শালগ্রামের একই অর্থ নির্দেশ করেছেন।

চলন্তিকা অনুযায়ী শালগ্রাম হল ছিদ্ররেখাযুক্ত বিষ্ণুবিগ্রহ-স্বরূপ শিলাপিণ্ড। অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের সঙ্গে শালগ্রাম অভিন্ন।

ভূবৈজ্ঞানিক মতে মেসোজোয়িক কল্পের জুরাসিক যুগে (১৮—১৩.৫ কোটি বছর আগে) স্থলে ডাইনোসর এবং জলে অ্যামোনাইটদের বিপুল বিস্তার ঘটে। তারপরের ক্রিটেশিয়াস যুগের (১৩.৫—৬.৫ কোটি বছর আগে) শেষেই কোনওকারণে এই অ্যামোনাইটরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদের মৃত জীবদেহ সমুদ্রে নরম পলিস্তরে চাপা পড়ে থাকে। দীর্ঘ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর চাপে তাপে নরম পলিস্তর শিলাস্তরে রূপান্তরিত হয় এবং জীবের মৃত দেহাবশেষ ওই শিলাস্তরে জীবাশ্মরূপে সংরক্ষিত হয়। প্যালিয়োসিন যুগে (৬.৫—৫.৮ কোটি বছর আগে) ভারত ভূখণ্ড এশিয়া ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে যায়। এই সময় পলিপূর্ণ টেথিস সাগর পার্শ্বচাপে ভাঁজ হয়ে হিমালয় পর্বতমালার উত্থান শুরু হয়। হিমালয়ের এক বিশেষ অংশের শিলাস্তর স্পিতি শেল নামে পরিচিত। এতে পাওয়া যায় জুরাসিক যুগের সামুদ্রিক জীবের জীবাশ্ম। কালীগণ্ডকী নদীর উৎপত্তিও সেই চিরতুষারাবৃত অঞ্চলেই। জলের তীব্র স্রোতে শিলাস্তর ক্ষয় পাচ্ছে এবং শিলাস্তরের খাঁজে থাকা জীবাশ্ম ভেসে আসছে। অ্যামোনাইট প্রাণীগোষ্ঠীর জীবাশ্ম আরও মেলে কচ্ছের জুরাসিক শিলাস্তরে, পণ্ডিচেরির ক্রিটেশিয়াস শিলাস্তরে, মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে ও নর্মদা উপত্যকায়। কিন্তু শুধু স্পিতি শেলের জুরাসিক অ্যামোনাইট জীবাশ্মগুলিই শাস্ত্রীয় গুরুত্ব পেয়েছে। অ্যামোনাইটরা বহুসংখ্যক গণে বিবর্তিত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি হল পেরিস্ফিংটিস। এই গণের প্যারাবোলিসোরাস, ভিরগাটোস্টিংটিস, অলাকোস্টিংটিস—এই তিনটি উপগণ থেকে সৃষ্ট প্রজাতির জীবাশ্ম হিন্দুশাস্ত্রে শালগ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যাকে আমরা দামোদর শালগ্রাম শিলা বলে জানি, সেটি আসলে রাজা নামক প্রজাতির জীবাশ্ম। ফ্রিকয়েন্স প্রজাতির জীবাশ্ম পদ্মনাভ শালগ্রাম শিলারূপে পরিচিত।

অ্যামোনাইট জীবাশ্ম কেন বিষ্ণুর প্রতিভূ শালগ্রাম পদবাচ্য, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এই প্রাণীগোষ্ঠীর শারীরবৃত্তীয় কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিষ্ণুর কিছু মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রাণিদেহের কুণ্ডলাকার গঠন শালগ্রাম শিলায় নাভিচক্র বা বিষ্ণুচক্র সৃষ্টির প্রতীক। দেহমধ্যস্থ সিউচার রেখার অলংকরণ ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী বিষ্ণুর

বনমালা। প্রাণিদেহের পিঠের খোলকের নিচে সাইফাঙ্কেল পাইপকে মনে করা হয় ব্রাহ্মণ নারায়ণের পৈতে-চিহ্ন। এই রূপকল্প আগ্রহী করে তুলেছিল দক্ষিণ ভারতে ধর্মপ্রচারে আসা ফরাসি মিশনারি Jean Calmetteকে। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি যে-শালগ্রাম শিলা দেখেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা তাঁর চার্চকে ছয়শো ছয়টি চিঠিতে লিখে জানান ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে।

মহাকাব্যের সময়কাল থেকেই শালগ্রাম শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতের বনপর্বে নারায়ণের শালগ্রাম নাম-প্রসঙ্গ রয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যে ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শালগ্রাম বিষ্ণুর প্রতিভূ বলে উল্লেখিত। রাজস্থানের চিতোরগড়ের কাছে নাগরী গ্রামে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর হাথিওয়ারা-ঘসুণ্ডী শিলালিপিতে প্রথম বাসুদেব-সংকর্ষণের শালগ্রাম উপাসনার ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হয়। লিপিটির পাঠোদ্ধার করেছেন আর ডি ভাণ্ডারকর। এই পাঠ অনুযায়ী পরাশর গোত্রভুক্ত মাতার সন্তান অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ভক্ত রাজা সর্বতত সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের ‘শিলারূপ’-এর উপাসনার জন্য ‘নারায়ণ-বাটিকা’ নামে আবৃত দেওয়ালটি নির্মাণ করেছেন।[২] একইসময়ে মথুরার কাছে প্রাপ্ত মোরা শিলালিপিতে বিষ্ণুর পঞ্চব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং শাম্বের প্রতিমা-রূপের পাশাপাশি শালগ্রামরূপের উল্লেখ রয়েছে।[৩]

মাতৃকাভেদতন্ত্রে শালগ্রাম শিলা পূজার আধার বা প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অন্তর্গত বিষ্ণুযামলতন্ত্রে একইসঙ্গে প্রতিমা ও শালগ্রাম উপাসনাকে বৈষ্ণব সদাচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে, এর চতুর্দিকে দুই ক্রোশ স্থান তীর্থতুল্য। এ-শিলায় যেকোনও দেবতার পূজা হতে পারে এবং তাতে প্রতিমার মতো আবাহন-বিসর্জনের প্রয়োজন নেই।

বর্ণ এবং চক্র অনুযায়ী শালগ্রাম শিলার বিভিন্ন শ্রেণি নির্দেশিত হয়েছে; যেমন স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, লোহিতবর্ণ, একচক্র, বহুচক্র, বৃহচ্চক্র ইত্যাদি শালগ্রাম শিলা। বিভিন্ন শালগ্রাম শিলার গুণেরও বিবরণ দেওয়া আছে; যেমন স্নিগ্ধবর্ণ শিলা মন্ত্রদায়িকা, কৃষ্ণবর্ণ শিলা কীর্তিদায়িকা, পাণ্ডুবর্ণ শিলা পাপনাশিনী, পীতবর্ণা পুত্রফলদাত্রী, নীলবর্ণা লক্ষ্মীদাত্রী। প্রাণতোষণী তন্ত্রে ‘বীরমিত্রোদয়’ গ্রন্থের একটি কাহিনি উল্লেখিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার অপরাধে বেদশির মুনি গণ্ডকী নদীতে রূপান্তরিত হওয়ার অভিশাপ দেন নর্তকী মঞ্জুবাককে। পরে বলেন, শিলারূপে বিষ্ণু নদীগর্ভে জন্ম নিলে এই অভিশাপ কেটে যাবে। মঞ্জুবাকের তপস্যায় তুষ্ট বিষ্ণু শালগ্রামরূপে গণ্ডকী নদীগর্ভে আবির্ভূত হন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের উপাখ্যানটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই কাহিনি অনুসারে সরস্বতীর অভিশাপে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী বৃক্ষরূপা হন এবং নারায়ণের বরে তুলসী হয়ে জন্মলাভ করেন। ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা তুলসী দীর্ঘ তপস্যার ফলস্বরূপ ব্রহ্মার কাছ থেকে নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করার বর পান। পরে দৈত্য শঙ্খচূড়ের পরাক্রমে দেবতারা বিপর্যস্ত হলে নারায়ণ শঙ্খচূড়ের বেশে তাঁর পত্নী তুলসীর সতীত্ব হরণ করেন। বস্তুত এটিই ছিল শঙ্খচূড় বিনাশের একমাত্র শর্ত। প্রকৃত সত্য জানার পর তুলসী নারায়ণের এমন

পাষাণবৎ আচরণের জন্য তাঁকে পাষাণরূপে মর্তে জন্মগ্রহণের শাপ দেন। নারায়ণ তখন তুলসীকে তপস্যার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, তুলসীর দিব্যদেহ মর্তে পুণ্যসলিলা গণ্ডকী নদীতে পরিণত হবে এবং অভিশাপের ফলে শিলারূপে নারায়ণ ওই নদীতীরে অবস্থান করবেন। বজ্রের মতো দন্তবিশিষ্ট বজ্রকীটের দ্বারা শিলার অভ্যন্তরে বিষ্ণুচক্র রচিত হবে। প্রসঙ্গত কার্তিক মাসের প্রবোধিনী একাদশী এবং কার্তিক পূর্ণিমার মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শালগ্রাম ও তুলসীর বিবাহ অনুষ্ঠান পালিত হয়।

শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী বঙ্গদেশে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের অন্যতম সংগঠক অদ্বৈত আচার্য পঞ্চদশ শতকে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে গণ্ডকী নদী থেকে শালগ্রাম শিলা এনে শান্তিপুরে নিজ বাসভবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, "শালগ্রামের প্রসাদ পাইলে আনন্দেতে মত্ত।" এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় রাজা দিব্যসিংহের অচৈতন্য পুত্রকে শালগ্রামবিধৌত জল দ্বারা সুস্থ করে তুলেছিলেন অদ্বৈত। স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গৃহদেবতারূপেও দামোদর শিলার অধিষ্ঠান ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে জগন্নাথ মিশ্রের কণ্ঠে শোনা যায়, "ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।/ পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান।" গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার বর্ণনায় গঙ্গাতীরে নবদ্বীপবাসীর বিষ্ণুপূজার বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় এখানে বিষ্ণুশিলা সেবার কথাই বলা হচ্ছে। আদিখণ্ডে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এক ব্রাহ্মণকে দেখা যায়, যাঁর "কণ্ঠে বালগোপাল-ভূষণ শালগ্রাম।" ভারতে অনেকে গলায় শালগ্রাম শিলা ধারণ করেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, ধনপতি সদাগর শালগ্রাম শিলা ধোয়া জল পান করে সন্ধ্যার আহার করতে বসেছে।

বঙ্গদেশের রামপূজার ধারায় রামশিলার পারিবারিক উপাসনাও উল্লেখযোগ্য। মানুষ বিষ্ণুমন্ত্রের পাশাপাশি রামমন্ত্রেও দীক্ষিত হত। চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দের গৃহদেবতা ছিলেন রঘুনাথ শিলা। চৈতন্যদেবের অমোঘ প্রভাব বঙ্গের রামভক্তির ধারাটিকে কৃষ্ণভক্তির ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। নামসংকীর্তনে হরেকৃষ্ণর সঙ্গে রামনামকেও গ্রহণ করা হয়। ভক্তদৃষ্টিতে চৈতন্যদেব শুধু শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন না, হয়ে উঠেছিলেন রামচন্দ্রেরও সাক্ষাৎ বিগ্রহ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিগ্রন্থেও শালগ্রাম উপাসনা গুরুত্ব পেয়েছে। সনাতন গোস্বামী বৃহৎভগবতামৃত গ্রন্থে ভক্তিলাভের সোপান হিসেবে যে-ক্রমপর্যায়গুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল—অহৈতুকী মহৎকৃপা, মহৎসেবা, দীক্ষা, মন্ত্রজপ, সৎসঙ্গ এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীমূর্তি বা শালগ্রাম শিলা দর্শন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসে শালগ্রাম শিলার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, গৌতমীয় তন্ত্রভাষ্য উদ্ধার করে শালগ্রামের বিবিধ রূপলক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যেমন উঠে এসেছে তেমনই বৈদিক যজ্ঞমাহাত্ম্যের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে শালগ্রাম উপাসনাকে। পদ্মপুরাণের মাঘ মাহাত্ম্যের সূত্র উল্লেখ করে স্মৃতিকার জানান, শালগ্রাম শিলায় হরির নিত্য উপাসনা করলে হাজার রাজসূয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্রেরা শালগ্রাম স্পর্শ করতে পারবেন না। অন্যদিকে স্কন্দপুরাণ

বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, নারী সকলকেই শালগ্রাম উপাসনার অধিকার দিয়েছেন। এই দুই মতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য স্মৃতিকার ভক্তির মানদণ্ডকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ভক্ত শূদ্রের শালগ্রাম পূজার অধিকার আছে কিন্তু ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের এই অধিকার নেই। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী ধাতু বা প্রস্তর প্রতিমায় হরি নিত্য বিরাজ করেন না কিন্তু শালগ্রাম শিলায় তাঁর চির অধিষ্ঠান।

কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-সাধনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে দেখি, গোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীদামোদর নামে একটি শালগ্রাম শিলা ছিল। একদিন এক ধনী মহাজন বৃন্দাবনের সমস্ত বিগ্রহের জন্য নানা বস্ত্রালঙ্কার দান করলেন। শালগ্রাম শিলার দেহাবয়ব না থাকায় ভট্ট গোস্বামী বস্ত্রালঙ্কারে তাঁর পূজ্য শালগ্রামকে সজ্জিত করতে না পেরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সকালে উঠে তিনি দেখলেন তাঁর শালগ্রাম চক্র অনুপস্থিত, সেখানে ত্রিভঙ্গ মুরলীমোহন কৃষ্ণমূর্তি বিরাজমান। ১৫৪২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় এই রাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের কয়েকটি বিখ্যাত মূর্তির সঙ্গে শালগ্রাম শিলা জড়িয়ে রয়েছে। কিংবদন্তি, হিমালয়ের বদরিনাথের মূর্তিটি শালগ্রাম শিলা থেকে দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এবং দেবর্ষি নারদই এই মূর্তির প্রথম পূজক। জোশীমঠের নৃসিংহ বিগ্রহ শালগ্রাম শিলায় তৈরি বলে কথিত। কর্ণাটকের উড়ুপির কৃষ্ণমূর্তি সম্পর্কেও একই ধারণা চলে আসছে। জনশ্রুতি, তিরুবনন্তপুরমের পদ্মনাভস্বামীর বিগ্রহ এবং থিরুভাত্তার মন্দিরের বিগ্রহ শালগ্রাম শিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরীর জগন্নাথদেবের নবকলেবরের সময় পুরনো মূর্তি থেকে নতুন মূর্তির অভ্যন্তরে যে-'ব্রহ্মপদার্থ'টি স্থানান্তরিত করা হয়, জনবিশ্বাস অনুযায়ী সেটি শালগ্রাম শিলা। একইরকম 'বিশেষ পদার্থ' তিরুপতির ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির, দ্বারকাধীশ মন্দির এবং বেট দ্বারকার কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মন্দিরের বিগ্রহের অভ্যন্তরেও রক্ষিত বলে শোনা যায়। বিগ্রহ উপাসনায় শালগ্রামের সাঙ্গীকরণকেই নির্দেশ করছে এসব কিংবদন্তি। তিরুমলের ভেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি একশো আটটি শালগ্রাম শিলায় সজ্জিত। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব পাটবাড়িগুলিতে বিগ্রহের সঙ্গে শালগ্রাম শিলার সহাবস্থান ও পূজা বর্তমান। নবদ্বীপে ধামেশ্বর মন্দিরে মহাপ্রভুর পৈতৃক শালগ্রাম শিলাটি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সঙ্গেই পূজিত হন। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী নবদ্বীপে যে-সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেও অষ্টধাতুর শ্রীচৈতন্য বিগ্রহের সঙ্গে শালগ্রাম শিলা রয়েছে। অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে গৌর-নিতাই দারুবিগ্রহ এবং শালগ্রাম শিলার সহাবস্থান দেখা যায়। চৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলার অষ্টম খণ্ডে দেখা যায় শ্রীবাসের ঘরে আবেশে মত্ত মহাপ্রভু শালগ্রাম শিলা কোলে নিয়ে বিষ্ণুখট্টার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করছেন এবং ঘোষণা করছেন, 'কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ'। মধ্যলীলার ২২ তম পরিচ্ছেদেও শালগ্রাম শিলা ধারণ করে মহাপ্রভুর নিজেকে কলির কৃষ্ণ বলে উল্লেখ যেন পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাধনায় শালগ্রাম সাধনার ধারাকে আত্মীকরণের ইঙ্গিতবাহী।

উনিশ শতকের কলকাতায় ব্রাহ্মণ দিয়ে গৃহদেবতারূপে নিত্য শালগ্রাম উপাসনা

কুলগরিমা প্রচারের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। যেমন, জানবাজারে রানি রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতরাম মাড় যিনি কৈবর্ত হয়েও বিত্তগৌরবে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরও গৃহদেবতা রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা। বর্তমানে এই শিলাটি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেবিত হচ্ছে। কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের গৃহদেবতারূপে দুটি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার কথা জানা যায়। একটি পঞ্চানন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, আর-একটির প্রতিষ্ঠাতা গোপীমোহন ঠাকুর।[৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে ধরণী কথকের কথকতার আসরের বর্ণনায় বলেছেন, "সামনে একখানি বড়ো টিপাইয়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন। তিনি কথার প্রধান শ্রোতা।"[৫] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কন্যা সুকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে শালগ্রাম শিলা বর্জন করে। এমন বিবাহ সমাজের চোখে অসিদ্ধ ছিল। কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় ১৮৭২ সালে 'ব্রাহ্মবিবাহ বিল' বলে একটি আইনের খসড়া তৈরি হয় যেখানে বলা হল কোনও প্রকার পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান ছাড়াও বিবাহ আইনসঙ্গত হতে পারে। পরে এর নাম হয় 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট'। শালগ্রাম শিলা আর একবার চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে অযোধ্যা রামমন্দিরে রামলালার বিগ্রহকে কেন্দ্র করে। প্রথমে শালগ্রাম শিলাতেই বিগ্রহ নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছিল। নেপাল থেকে শালগ্রাম শিলা অযোধ্যায় পৌঁছলেও শেষপর্যন্ত নির্মাণগত অসুবিধার কারণে বিগ্রহ তৈরিতে তা ব্যবহৃত হয়নি, যদিও মন্দিরে শিলাটি পূজিত হচ্ছে। বর্তমানে নেপালের একটি মূল্যবান বৈদেশিক বাণিজ্যসামগ্রী হয়ে উঠেছে শালগ্রাম শিলা। প্রসঙ্গত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডের একটি পুঁথিতে ১০৯৬ বঙ্গাব্দে লিখিত শালগ্রাম শিলা বন্ধকের দলিল পেয়েছিলেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। জনৈক রামচন্দ্র শর্মা তাঁর পৈতৃক দুটি শালগ্রাম শিলা রামেশ্বর সেন মজুমদারের কাছে বন্ধক রেখে দুটাকা কর্জ নিয়েছিলেন। দলিলে শর্ত ছিল, শালগ্রামসেবাজনিত পুণ্যের অধিকারী হবেন রামেশ্বর।[৬] অর্থের বিনিময়ে পুণ্যের এই লেনদেন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে শালগ্রামের নতুনতর অর্থ প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জীবাশ্ম পরিচয় থেকে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি, ব্রাহ্মণ্যবাদের পরাকাষ্ঠারূপে আত্মপ্রকাশ থেকে সমাজে অনুশাসকের মর্যাদা প্রাপ্তি—এই দীর্ঘ বিবর্তন পথ পেরিয়ে শালগ্রাম উপাসনার ধারা আজও সজীব ও প্রাসঙ্গিক। ✠

তথ্যসূত্র

১। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪২৪, অখণ্ড, পৃঃ ৬০৩

২। D.R Bhandarkar, *HATHIBADA INSCRIPTION at NAGARI, Epicgraphia Indica* (Vol- xxii), Archaeological Survey of India, p. 198-205

৩। *Epicgraphia Indica* (Vol. xxiv), Archaeological Survey of India, p. 194 ff.

৪। চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ৪৬

৫। সম্পাদনা: দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ,* খণ্ড ২, নাথ পাবলিশিং: কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১৪

৬। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *নিবন্ধ সংগ্রহ-২, ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ১৩